International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VI, Issue-II, September 2019, Page No. 08-18
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v6.i2.2019.8-18

Genocide and Slaughter-house: Bera Upazilla

Irin Akter
Lecturer, Department of Bangladesh and Liberation War Studies, Noakhali Science and Technology University, Noakhali, Bangladesh

Abstract

In 1947 the Indian Sub-continent divided into two portion Pkistan and India. The partition of British India along religious lines into two states destroyed the political unity of Bengal. The Pakistan had two wings of its own East Pakistan (present Bangladesh) and West Pakistan. The peculiar geography of Pakistan made it inevitable and nothing else, would sooner or later be centrifugally driven apart. And finally as obvious it happened in 1971. Because there were no similarity between the two wings of Pakistan. From the beginning East Pakistan was deprived from all the basic things they needed. It's happened language to everywhere. From 1952 to 1971 East Pakistan people had been struggled and gave their blood for freedom. In 1952 Language Movement occurred, in 1954 the United Front Election held but the elected body could not stay so long to power because of Muslim League conspiracy, in 1958 Pakistan military stepped into power and declared Martial Law, in 1962 Students Movement was held, in 1966 Sheikh Mujibur Rahman launched Six-Point and based on it Ayub Khan filed a suit against him which called Agartala Conspiracy case, in 1969 Mass-Upsurge occurred, in 1970 the general election of Pakistan held and East Pakistan won but West Pakistan did not want that elected body took the ultimate power of Pakistan and the final conspiracy started against the people of East Bengal. On 25th March 1971 military force of West Pakistan suddenly attacked the people of Bangladesh and started to killed them mercilessly. The main objective of the paper is to bring up the Genocide and the Slaughterhouse which took place in 1971.The study is a qualitative study mainly based on Eye-Witness's description including books, articles, newspaper and different reports. The paper attempts to show how the military force of Pakistan killed the people of Bangladesh and made Bangladesh a place of public execution. They show their cruelty all over the Bangladesh during Liberation War. The main focus of the paper is Bera Upazila's Slaughter-house and Genocide of 1971.

***Keywords**: Genocide, Slaughter-house, Bera Upazila, Interviews.*

ভূমিকা: স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ নামক একটি দেশ পেয়েছিল স্বাধীনতার সেই আস্বাদ। আর এই স্বাধীনতা অর্জনে এদেশের মানুষদের করতে হয়েছিল নিদারুন আত্নত্যাগ, দিতে

হয়েছিল বুকের তাজা রক্ত। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল। জন্মলগ্ন থেকেই সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক সহ সকল ক্ষেত্রে যারা হয়েছিল শুধু বঞ্চিত। যে বঞ্চনা পূর্ব পাকিস্তানের মানুষদের করে তুলেছিল সংগ্রামী ও মুক্তিকামী। বঞ্চিত এসকল মানুষদের স্বাধীনতার চেতনায় উজ্জীবিত করতে এবং সংগ্রাম করে মুক্তি ছিনিয়ে আনতে অপরিমেয় সাহস যুগিয়েছিলেন একজন মহান নেতা যার নাম শ্রদ্ধা আর ভালবাসায় উচ্চারিত হয় কোটি মানুষের মুখে, তিনি হলেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ, তেজদীপ্ত কণ্ঠস্বর কোটি কোটি বাঙালির হৃদয়ে যুগিয়েছিল স্বাধীনতা অর্জনের দৃঢ়প্রত্যয়। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ কালরাতে যখন ভীরু-কাপুরুষের মত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র, ঘুমন্ত বাঙালিদের ওপর অতর্কিত হামলা করেছিল ঠিক সেই রাতে আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ধানমন্ডির নিজ বাসভবন থেকে ওয়ারলেস যোগে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত বাঙালিরা যেন যুদ্ধ চালিয়ে যায়। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ শুরু হওয়া পাক হানাদারদের সেই গণহত্যা চলেছিল প্রায় নয় মাস। এই নয় মাসে সমগ্র বাংলাদেশের হানাদার বাহিনীরা চালিয়েছিল নৃশংস হত্যাকান্ড। বাংলাদেশকে তারা পরিণত করেছিল বধ্যভূমিতে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এসকল বধ্যভূমি এখনও সেই নিষ্ঠুরতম হত্যাকান্ডের স্বাক্ষ্য বহন করে চলেছে। নিষ্ঠুরতম এই হত্যাকান্ড থেকে বাদ যায়নি দেশের প্রত্যন্ত এলাকাগুলোও। পাবনা জেলার বেড়া উপজেলাতেও হানাদার বাহিনী চালিয়েছেল গণহত্যা। এই উপজেলাতেও রয়েছে অনেকগুলো বধ্যভূমি। যা আজও হানারদার বাহিনীদের কৃত বর্বরতার প্রমাণ বয়ে বেড়াচ্ছে।

গবেষণা পদ্ধতি: পাবনা জেলার অন্তর্গত বেড়া উপজেলায় সংঘটিত গণহত্যার সঠিক তথ্য নিরূপনের লক্ষ্যে পরিচালিত গবেষণার ক্ষেত্রে মূলত প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরনই মূল পদ্ধতি হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। পাশাপাশি কিছু সংবাদপত্রের দেয়া প্রতিবেদন অত্যন্ত সতকর্ত তার সাথে যাচাই-বাছাই পূর্বক গৃহীত হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন সময় ইতস্ততভাবে লিখিত প্রবন্ধ ও স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা সংগৃহীত তথ্য এক্ষেত্রে সন্নিবেসিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রাথমিক ভাবে গৃহীত তথ্যই এই গবেষণার মূল উপজীব্য বিষয় হিসেবে বিবেচিত। তবে এক্ষেত্রে কিছু সতর্কতা অবশ্যই অবলম্বন করতে হয়েছে। কারন মহান মুক্তিযুদ্ধের এত বছর পর তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বেশকিছু জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তন্মধ্যে প্রধান কারন হল অনেক মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যু বরণ এবং যেসকল মুক্তিযোদ্ধা বা প্রত্যক্ষদর্শী জীবিত আছেন তাদের অনেকেই ইতোমধ্যে অনেক বিষয়ই বিস্মৃত হয়েছেন। যা একটি নির্ভুল গবেষণার অন্তরায়। এসকল জটিলতার বিষয় বিবেচনায় রেখেই গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে। বর্তমান গবেষণাটি গণহত্যা ও বধ্যভূমির সঠিক ইতিহাস নিরূপনের ক্ষেত্রে অনেক বেশি সহায়ক হবে বলে আশাবাদী।

বেড়া উপজেলা: বেড়া উপজেলা পাবনা জেলার অন্তর্গত অন্যতম প্রসিদ্ধ একটি উপজেলা। এই উপজেলার আয়তন ২৪৮.৬০ বর্গ কি.মি.। বেড়া উপজেলার নাম নিয়ে বেশকিছু জনশ্রুতি রয়েছে। তন্মধ্যে একটি জনশ্রুতি হল বেড়ার পূর্ব নাম ছিল 'শম্ভুপুর'। অনেকের ধারণা 'বেড়ুহা' শব্দ থেকে বেড়া নামটি এসেছে। এই বেড়ুহা শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কারও মতে শব্দটি এসেছে ফারসী ভাষা থেকে আবার কেউবা মনে করেন শব্দটি আরবি ভাষা থেকে এসেছে। যাই হোক এই বেড়হা শব্দের অপভ্রংশ হচ্ছে 'বড়া'। এই 'বড়া' শব্দটি কালক্রমে বেড়া নামে প্রচলিত হয়েছে। বহুকাল পূর্বে পারস্য দেশের বণিকেরা এদেশে ব্যবসার জন্য এসেছিল। তারা তাদের ভাষায় 'বেহড়া' শব্দটি উচ্চারন করত যার অর্থ 'নিরাপদ বন্দর'। পরবর্তীতে তাদের উচ্চারন অপভ্রংশ হয়ে 'বেড়া হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

ইছামতি, হুরাসাগর আর যমুনার সঙ্গমস্থল তীরবর্তী বেড়া নামক বন্দরটি সুলতানী আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে জনশ্রুতি রয়েছে। খ্রীস্টের জন্মের বহু আগে থেকেই উত্তরবঙ্গের নদ-নদীর মিলনস্থল হিসেবে বেড়া (তখন বেড়া শম্ভুপুর নামে পরিচিত ছিল) বেশ পরিচিত ছিল। পরবর্তীতে এখানে জনবসতি গড়ে উঠেছিল। সেসময়

উত্তরবঙ্গের নদীপথে জলদস্যুদের আক্রমণ ছিল নিত্তনৈমিত্তিক ব্যাপার। নদীর প্রবল স্রোত এবং জলদ্যুদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়ে বেড়ার নিকটবর্তী হলেই সকলে নিজেদের নিরাপদ মনে করত। যে কারনে সেসময় নিরাপদ বন্দর হিসেবে বেড়া পরিচিতি লাভ করে। খুব সম্ভবত ৮০০ খ্রিস্টাব্দের গোঁড়ার দিকে আরব বণিকেরা বেড়ায় তাদের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে তুলেছিল। জানা যায় সুলতানী শাসনামলে আরব দেশে একবার ভয়ঙ্কর দূভির্ক্ষ হয়েছিল। সেই দূর্ভিক্ষ মোকাবেলায় এই দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ বেড়া বন্দরের মাধ্যমে আরব দেশে পাঠিয়েছিলেন। আবার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামলে জলদস্যু নিয়ন্ত্রণে যমুনার পূর্ব উপকূলে 'মথুরা' নামক একটি প্রশাসনিক থানা স্থাপন করা হয়। থানাটি যমুনা নদীর গর্ভে বিলীন হয়ে যাবার পর পুনরায় থানাটি বেড়া নামক স্থানে যমুনার পশ্চিম উপকূলে ১৮২৮ সালে পুন:স্থাপিত হয়। ১৯৪৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশ বিভক্ত হওয়ার পর ১৯৬০ সালের দিকে উন্নয়ন সার্কেল হিসেবে বেড়ার কার্যপরিধি অনেক বেড়ে যায়। পরবর্তীতে বেড়া থানাকে ১৯৮৩ সালের ১৫ এপ্রিল উপজেলায় উন্নীত করা হয়।

বেড়া উপজেলার উত্তরে সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর ও চৌহালি উপজেলা, দক্ষিণে রাজবাড়ি জেলার গোয়ালন্দ ঘাট এবং রাজবাড়ি সদর উপজেলা, পূর্বে সিরাজগঞ্জের চৌহালি এবং মানিকগঞ্জ জেলার দৌলতপুর ও শিবালয় উপজেলা, পশ্চিমে পাবনা জেলার সুজানগর ও সাঁথিয়া উপজেলা। বেড়া উপজেলা মোট ভূভাগের ৭০% নদীর তীরে অবস্থিত । এই উপজেলার মানুষের মূল পেশা ছিল নৌপরিবহন ও মৎস আহরণ। যদিও এখন মানুষ অন্যান্য অনেক পেশার সাথেই জড়িয়ে পড়েছে। পদ্মা, যমুনা, হুরাসাগর, ইছামতি, আত্রাই নদী আর ধলাই, নন্দিয়ারা, মাসুমদিয়া বিলের সাথে এই এলাকার মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। নিরাপদ নৌঘাট হওয়ার কারনে বেড়া হয়ে উঠেছিল সোনালী আঁশ খ্যাত পাটের প্রসিদ্ধ ব্যবসাকেন্দ্র। এখান থেকে পাট কেনার জন্য সূদূর ব্রিটেন থেকে সরাসরি বিমান এসে নামত নাকালিয়া সংলগ্ন যমুনা নদীর তীরে, বিষয়টি জনশ্রুতি থেকে জানা যায়। বেড়া উপজেলার অন্যতম কুটির শিল্প হল তাঁতশিল্প। বেড়া উপজেলার যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রধান পথ হলো যমুনা নদীর পথ। যোগাযোগের দ্বিতীয় মাধ্যম হলো সড়কপথ। নগরবাড়ি থেকে যমুনা অভিমুখে চলে যাওয়া হাইওয়ে সড়ক বেড়া উপজেলার সীমান্ত দিয়ে চলে গেছে। এছাড়া এই হাইওয়ে সড়ক থেকে বেড়া সদরের পথে মুক্তিযুদ্ধের সময়কালে একটি কাঁচা সড়কপথ ছিল, যা থানার অন্যান্য স্থানের মধ্যে শাখা বিস্তার করে চলে গেছে। এখানকার প্রায় ২৫% জনগন তাঁত শিল্পের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত। বেড়া উপজেলায় রয়েছে একটি পৌরসভা ও নয়টি ইউনিয়ন। বেড়া পৌরসভাটি প্রথম শ্রেণীর পৌরসভা। এই উপজেলার মোট মৌজা সংখ্যা ১৬১টি।

গণহত্যা: গণহত্যা শব্দটি ইংরেজি Genocide শব্দ থেকে এসেছে। মূলত গ্রীক শব্দ Genos (যার অর্থ জাতি,মানুষ) এবং ল্যাটিন শব্দ cide (যার অর্থ হত্যাকান্ড) থেকে ইংরেজি Genocide শব্দটি এসেছে। গণহত্যা বলতে নির্দিষ্ট একটি ভৌগোলিক অংশে একযোগে বা অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ হত্যা করাকে বোঝায়। গণহত্যা জাতিগত, বর্ণগত, ধর্মীয় বা নৃতত্ত্বীয় গোষ্ঠী হিসাবে বিবেচিত মানুষজনকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ধ্বংস করার ইচ্ছাকৃত কার্য। 'গণ'অর্থ গোষ্ঠী এবং 'হত্যা'র অর্থ সংহার। অর্থাৎ গণহত্যা হল জাতীয়, নৃগোষ্ঠীয়, বর্ণগত বা ধর্মীয় গোষ্ঠীকে সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে কার্যসাধন করা।

এফবিআই এর মতে, "গণহত্যা হল সেই হত্যাকান্ড যখন কোন একটা ঘটনায় চার বা তার অধিক সংখ্যক মানুষ মারা যায় এবং হত্যাকান্ডের মাঝে কোন বিরতি থাকে না। গণহত্যা সাধারনত একটি নির্দিষ্ট স্থানে ঘটে, যেখানে এক বা একাধিক মানুষ অন্যদের মেরে ফেলে। অনেক গণহত্যার শেষে হত্যাকারী আত্যহত্যা করে অথবা পুলিশের হাতে নিহত হয়"।

১৯৪৮ সালের ৯ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারন পরিষদে গৃহীত রেজ্যুলেশন ২৬০ (৩) এর অধীনে গনহত্যাকে

এমন একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় যা বিশ্বময় প্রতিরোধে সকল রাষ্ট্র অঙ্গীকারবদ্ধ। গণহত্যা বলতে এমন কর্মকান্ডকে বোঝায় যার মাধ্যমে একটি জাতি, ধর্মীয় সম্প্রদায় বা নৃতাত্তিক গোষ্ঠীকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে নিশ্চিহ্ন করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে বা হচ্ছে। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী গণহত্যা কেবল হত্যাকান্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ২৬০ (৩)-এর অনুচ্ছেদ-২ এর অধীনে যেসকল কর্মকান্ডকে আইনগত ভাবে গণহত্যা হিসেবে বিবেচনা করা হয় তা হল-

(ক) পরিকল্পিত ভাবে একটি জাতি বা গোষ্ঠীকে নির্মূল করার জন্য তাদের সদস্যদেরকে হত্যা বা নিশ্চিহ্ন করণ।
(খ) তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করবার জন্য শারীরিক বা মানসিকভাবে ক্ষতিসাধন।
(গ) পরিকল্পিতভাবে একটি জাতিকে ধ্বংস সাধনকল্পে এমন জীবননাশী অবস্থা সৃষ্টি করা যাতে তারা সম্পূর্ণ বা আংশিক নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।
(ঘ) এমন কিছু ব্যবস্থা নেয়া যাতে একটি জাতি বা গোষ্ঠীর জীবন ধারনে শুধু প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি নয়, সেই সাথে তাদের জন্ম প্রতিরোধ করে জীবনের চাকাকে থামিয়ে দেয়া হয়।
(ঙ) একটি জাতি বা গোষ্ঠীর শিশু সদস্যদেরকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে তাদের জন্ম পরিচয় বা জাতিগত পরিচয়কে মুছে ফেলাকেও গনহত্যা বলা হয়।

গণহত্যা প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যে দায়বদ্ধ, তার প্রমাণ পাওয়া যায় এটা প্রতিরোধকল্পে প্রণীত আইনগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে।

রেজ্যুলেশন ২৬০ (৩)-ও অনুচ্ছেদ-৩ অনুযায়ী গণহত্যা সাধন শুধু শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয়; গণহত্যার পরিকল্পনার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ একাজে যারা উদ্বুদ্ধ করবে তারাও এই অপরাধের কারনে বিচারাধীন হবে। এই উদ্বুদ্ধকরনের ব্যাপারে সরাসরি হোক বা নিভৃতে হোক কিংবা জনসম্মুখে উত্তেজক বক্তব্যের মাধ্যমেই হোক তা সমভাবে গুরুতর অপরাধ। গণহত্যা সাধনে ব্যর্থ প্রয়াস বা এ জাতীয় প্রচেষ্টার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনুচ্ছেদ-৩ অনুযায়ী বিচারাধীন হবে।

জাতিসংঘের সাধারন সভা ১৯৪৮ সালের ৯ ডিসেম্বর তারিখে "Convention on the prevention of the Crime of Genocide'' চুক্তির প্রস্তাব গ্রহণ করে। ২০টি রাষ্ট্র তা রেটিফাই করার পর ১৯৫১ সালের ১২ জানুয়ারি এটি আন্তর্জাতিক আইনে পরিণত হয়।

বধ্যভূমি: ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকার আলবদর, আলশামস্ সাধারণ নাগরিক, মুক্তিযোদ্ধা, বুদ্ধিজীবী, সরকারি-বেসরকারি চাকুরীজীবী ও সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের ধরে নিয়ে হত্যার জন্য কিছু নির্দিষ্ট স্থানকে ব্যাবহার করত যেগুলো পরবর্তীতে বধ্যভূমি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এইদেশ থেকে বাঙালিদের চিরতরে নিশ্চিহ্ন করার জন্য এক জঘন্য কর্মকান্ড চালায়। কোন ধরনের বিচার বিশ্লেষণ না করেই তারা যে নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল তারই দরুন সমগ্র বাংলাদেশ পরিণত হয়েছিল বধ্যভূমিতে।

বাংলাদেশের "War Crimes Facts Finding Committee" নামফলক স্থাপন করে ১৯৭১ সালের বধ্যভূমি গুলোকে সংরক্ষণের একটি মহতী উদ্যোগ নিয়েছে। এই উদ্যোগের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে টেক্সাস ভিত্তিক "Centre for Bangladesh Genocide Research" স্মৃতিফলক স্থাপনের জন্য তহবিল সংগ্রহ শুরু করেছে। "War Crimes Facts Finding Committee"র অনুসন্ধানে জানা যায়, দেশে ছোট বড় প্রায় পাঁচ হাজার বধ্যভূমি রয়েছে। এর মধ্যে মাত্র নয়শত বধ্যভূমি চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন সময় দেশের ৩৫টি স্থানকে বধ্যভূমি হিসেবে চিহ্নিত করে সেগুলো সংরক্ষনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রনালয় মহান স্বাধীনতা যুদ্ধকালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক ব্যবহৃত "বধ্যভূমি সমূহ সংরক্ষন ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ" নামের একটি উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব তৈরী করেছে যাতে প্রথমে দেশের ১৭৬টি বধ্যভূমি সংরক্ষনের উদ্যোগ নেয়া হলেও পরে প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে ১২৯টি বধ্যভূমি সংরক্ষন এবং সেখানে স্মৃতিস্থম্ভ নির্মানের উদ্যোগ নেয়া হয়।

বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে যেসকল বধ্যভূমি রয়েছে তার তালিকা প্রস্তুত বা সেগুলো সংরক্ষণের বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়ার কথা বললেও তেমন ফলপ্রসূ কোনো উদ্যোগ গৃহীত হয়নি। যে কারনে আজও অনেক বধ্যভূমি সংরক্ষণের অভাবে অবহেলিত হয়ে পরে রয়েছে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি হায়েনার দল বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে সেসকল অঞ্চলের স্থানীয় রাজাকার ও পাকিস্তানি দোসরদের সহায়তায় তান্ডব চালিয়েছে। ঘর-বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করেছে, যুবতী মেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়েছে, সাধারন মানুষদের ধরে নিয়ে গিয়ে হাত-পা বেঁধে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে ব্রাশ ফায়ার করেছে। হত্যাকান্ড ও তান্ডবলীলা সম্পন্ন করে নিহতদের মাটি খুঁড়ে সেখানেই মাটি চাপা দিয়েছে। এসকল স্থানকেই পরবর্তীতে বধ্যভূমি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাংলাদেশের বহু স্থানে এমন চিহ্নিত-অচিহ্নিত অসংখ্য বধ্যভূমি রয়েছে।

বেড়া উপজেলায় সংঘটিত গণহত্যা: ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে শুরু হওয়া পাক হানাদার বাহিনীর নৃশংস হত্যাকান্ড বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এলাকগুলোতেও অব্যাহত থাকে। পাবনা জেলার বেড়া উপজেলাতেও হানাদার বাহিনীর তান্ডব চলেছিল মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই। মূলত প্রতক্ষ্যদর্শীদের দেয়া বর্ণনা থেকে বেড়া উপজেলায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীদের দ্বারা সংঘটিত বর্বরতার প্রমাণ মেলে।

(ক) মো: আব্দুল মজিদ মোল্লা।
স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা।
গ্রাম- নাজিম বাজার,
বেড়া উপজেলা।

১৯৭১ সালের ১৯ এপ্রিল সোমবার দুপুর বেলা বেড়া উপজেলার মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকেই দুপুরে ভাত খাওয়ার অপেক্ষায় ছিল। এদের মধ্যে কেউ গোসল করে ক্যাম্পে ফিরে এসেছে আবার কেউ বা গোসলে নেমেছে। দুপুরের খাবার তখনও এসে পৌঁছায়নি। এমন সময় দেখা গেল কাশিনাথপুর থেকে পাইকরহাটির দিকে পাকিস্তানী পতাকাবাহী লাল রঙের একটি জিপ ছুটে আসছে এর পেছনে ছুটে আসছে সবুজ রঙের জিপ, তার পেছনে ৪/৫টি বড় গাড়ি এবং তার পেছনে ৪/৫টি বাস ট্রাকের কনভয়। মুক্তিবাহিনীর পাহারা রত সিপাহী বাইনোকুলারে এসব দেখে ভিউগল বাজায়। ক্যাম্পে কর্তব্যরত ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান সাহেব বাঁশি বাজিয়ে সবাইকে সতর্ক করে দেন এবং নিজ নিজ পজিশনে যেতে বলেন। এসময় মুক্তিযোদ্ধাদের অধিকাংশই ছিলেন অপ্রস্তুত। অনেকেই সঠিক অবস্থানে যেতে পারেনি। সুবেদার মেজর আলি আকবর ও হাবিলদার মোজাহারুল ইসলামের অবস্থান রাস্তার পূর্ব পাশে নেবার কথা থাকলেও তারা পশ্চিম পাশে অবস্থান নিতে বাধ্য হন। ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান অবস্থান নেন রাস্তার পূর্ব দিকে। এভাবে অনেকেই নিজ নিজ পূর্ব নির্ধারিত অবস্থানে যাবার সুযোগ ও সময় না পেয়ে সড়কের পাশে বিভিন্ন ভাবে আড়ালে আবডালে অবস্থান নিতে বাধ্য হয়। হানাদার বাহিনীর গাড়ি মুক্তিবাহিনীর কাছাকাছি আসা মাত্র গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়, এতে করে হানাদার বাহিনীর প্রথম জিপটি উল্টে রাস্তার পশ্চিম পাশে পড়ে যায়। এসময় ২/৩ জন অফিসার মারা যায়। হানাদার বাহিনীর অনেকে এসময় তাড়াহুড়ো করে গাড়ি থেকে নামার চেষ্টা করলে মুক্তিবাহিনীর মেশিনের গুলিতে অনেকেই মারা যায়। এমন সময় পাক বাহিনীর গুলিতে গ্রেনেড নিক্ষেপকারী মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। মুক্তিযোদ্ধারা সড়কের দুই পাশ থেকে তাদের হামলা অব্যাহত রাখায়

পাকহানাদার বাহিনীর সদস্যরা পেরে উঠছিল না। তারা বাস-ট্রাক থেকেই গুলি বর্ষণ করে যাচ্ছিল। এমন সময় হানাদার বাহিনীর কিছু সৈন্য তাদের পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী রাজাকারদের সহায়তায় মুক্তিযোদ্ধাদের পেছন থেকে হামলা করে। এতে মুক্তিযোদ্ধারা অসহায় অবস্থায় পরে যায়। হানাদার বাহিনীর সদস্যরা সড়কের পূর্ব ও পশ্চিম দিক দিয়ে মাঠের মধ্যে দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর হামলা করে বসে। এতে করে বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন এবং অনেকে পিছু হটে আসে।

এই যুদ্ধে প্রায় ৩০ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। যুদ্ধে পাকবাহিনীর ২৩/২৪ জনের মত মারা যায় এবং অনেকেই আহত হয়। শহীদ নগর গ্রামের ডা: আফাজ উদ্দিন মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। বিষয়টি পাশের গ্রামের জামাত নেতা আব্দুল বাসেদ গোপনে হানাদার বাহিনীকে খবর দিয়ে জানিয়ে দেয় এবং ডা: আফাজ উদ্দিনকে ধরিয়ে দেয়। হানাদার বাহিনী ডা: আফাজ উদ্দিনকে গাছের ডালে ঝুলিয়ে নির্মমভাবে নির্যাতন করে হত্যা করে।

(খ) জনাব, কোহির উদ্দিন আহমেদ।
প্রত্যক্ষদর্শী।
গ্রাম- খানপুরা, মধ্যপাড়া,
বেড়া উপজেলা।

মে মাসের প্রথম দিকের কোনো এক বিকেলে ভৈরব বাজার গ্রাম নিবাসী বেশ কয়েকজনকে হানাদার বাহিনীর সদস্যরা হত্যা করে। এদের মধ্যে ছিলেন-

(১) কেশব চন্দ্র দাশ (পিতা- কানাই লাল দাশ)।
(২) খোকন চন্দ্র হালদার (পিতা- বসন্ত কুমার হালদার)।

এর ঠিক ৪/৫ দিন পর পাল বাড়ি ব্রীজের দক্ষিণে পলায়নরত অবস্থা থেকে ধরে এনে কয়েকজনকে হত্যা করা হয়। এরা হলেন-

(১) নটু ঠাকুর (পিতা- পিতাম্বর ঠাকুর)।
(২) যতীন্দ্র মোহন পাল (পিতা- কৃৎঞ্চপদ পাল)।
(৩) কালা শীল ও তার স্ত্রী সহ আরও বেশ কয়েকজন।

মে মাসের প্রথম দিকে পাক বাহিনী রূপগঞ্জে প্রবেশ করে। পাক বাহিনীর সদস্যদের দেখেই সাধারন মানুষজন এদিক সেদিক ছুটতে থাকে। পালানোর সময় মিলিটারির গুলিতে নিহত হয়-

(১) রমেশ সাহা (অবঃ সৈনিক)।
(২) রাধা মিস্ত্রি।
(৩) ফটিক সাহা (পিতা- ফনি সাহা)।

(গ) মুছা প্রাং।
প্রত্যক্ষদর্শী।
পিতা: মৃত গোলামি প্রাং।
গ্রাম- চড়পাড়া, বেড়া।

১৯৭১ সালের মে মাসের ৮ তারিখ (বৃহস্পতিবার) শেষ রাতে স্থানীয় রাজাকার আসাদের সহায়তায় ২২/২৩ জন আর্মি করমজা গ্রাম ঘেরাও করে। তারা ৩/৪ জন করে দল গঠন করে। দলগুলো বাড়ি বাড়ি গিয়ে হিন্দুদের

ডেকে নিয়ে আসে এবং সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড় করিয়ে নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করে। সেদিন যারা নিহত হয়েছিলেন তারা হলেন-

(১) ষষ্টি হালদার (পিতা- প্রাণনাথ হালদার)।
(২) শান্তি হালদার (পিতা- শশী হালদার)।
(৩) আদু হালদার (পিতা- রাইচরণ হালদার)।
(৪) কার্তিক হালদার (পিতা- রাইচরণ হালদার)।
(৫) সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ওরফে মেঘা ঠাকুর (পিতা- হরিকিশোর ভট্টাচার্য)।
(৬) দ্বিজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (পিতা- মেঘা ঠাকুর)।
(৭) করু ভট্টাচার্য (পিতা- মেঘা ঠাকুর)।
(৮) মুরালী মালি (পিতা- যোগেশ্বর মালি)।
(৯) ফকির চাঁদ।
(১০) জগদীস চন্দ্র শীল (চেয়ারম্যান- করমজা ইউনিয়ন)।

নিহত হিন্দুদের মৃতদেহ সৎকার করার জন্য তেমন সাহসী কোন হিন্দুকে পাওয়া যায়নি। স্থানীয় মসুলমানেরা হিন্দুদের সহায়তায় গর্ত করে মৃতদেহ গুলো মাটিতে পুঁতে রাখে।

(ঘ) জনাব, হবিবুর রহমান।
প্রত্যক্ষদর্শী।
পিতা: মিঠু প্রাং,
গ্রাম- চরপাড়া, বেড়া।

১৯৭১ সালের মে মাসের শেষ দিকে একদিন সকাল বেলা হানাদার বাহিনী নাটিয়াবাড়ি ক্যাম্প থেকে দক্ষিণ দিকে রওনা করে। হানাদার বাহিনীর গাড়ি দেখে সন্ন্যাসী বাধা গ্রামের বিরেন সাহা দৌঁড়ে পালিয়ে যেতে উদ্যত হলে সেখানেই তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এসময় চরপাড়া গ্রামের আঃ রশিদ দৌঁড়ে আশ্রয় নেয় স্থানীয় ছাপের মোল্লার বাড়ি। হানাদার বাহিনীর সদস্যরা সেখানে গিয়েই উপস্থিত হয়। এসময় ছাপের মোল্লার ছেলে হাসেন মোল্লা বাড়িতেই অবস্থান করছিল। সেখানেই তাদেরকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এরপর হানাদার বাহিনীর সদস্যরা বিভিন্ন বাড়িতে ঢুকে পুরুষ লোকজনদের ডেকে একত্রিত করে মিঠু প্রামাণিকের বাড়ির সামনের মাঠের মধ্যে জড়ো করে।এদেরকে মুক্তিবাহিনীর খবরাখবর জিজ্ঞেস করতে থাকে। উত্তর না পেয়ে মারধর করতে থাকে। একপর্যায়ে শিশু ও বৃদ্ধদের ছেড়ে দেয়। বাকীদের একসাথে দাঁড় করিয়ে এলোপাথারি ভাবে গুলি করতে থাকে। এতে নিহত হয় ১৫ জন এবং আহত হয় ৫ জন। নিহতরা হলেন-

(১) আঃ কাদের (পিতা- রউছ প্রাং)।
(২) ওসমান গণি (পিতা- রউছ প্রাং)।
(৩) এলেম (পিতা- কবির প্রাং)।
(৪) হোসেন আলী (পিতা- এছেম বেপারি)।
(৫) হাসেন আলী (পিতা- ঈমান বিশ্বাস)।
(৬) সেকেন্দার আলী (পিতা- বলাই মন্ডল)।
(৭) আমীর আলী (পিতা- জয়নাল বিশ্বাস)।
(৮) এাছেম (পিতা- রাজাই)।
(৯) আজহার আলী (পিতা- ফয়েজ প্রাং)।
(১০) খোকা (পিতা- কাজেম ডাঃ)।

(১১) সদর আলী (পিতা- দারোগ আলী)।
(১২) আঃ হাকিম (পিতা-আক্কাস প্রাং)।
(১৩) জুলে।
(১৪) আব্দুল করিম।
(১৫) আঃ সালাম।

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর এই ধরনের পাশবিক অত্যাচারে ভীত হয়ে মে মাসের শেষ দিকে শীতলপুর গ্রামের ১৪/১৫ জন হিন্দু যুবক ভারত যাবার উদ্দ্যেশে রওনা হয়। কিছু দূর যাবার পর তারা দূর থেকে পাকবাহিনীদের দেখতে পায়। এসময় তারা ভয়ে পাশের ইট ভাটায় লুকিয়ে পড়ে। কিন্তু শেষ রক্ষা আর হয় না। পাকবাহিনীর সদস্যরা তাদেরকে ইটের ভাটায় লুকিয়ে পড়তে দেখে ফেলে এবং ভাটা ঘেরাও করে ফেলে। ভাটা থেকে সবাইকে বের করে নিয়ে এসে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড় করায় এবং চোখের পলকে সকলকে একসাথে ব্রাশ ফায়ার করে হত্যা করে লাশ সেখানে ফেলে রেখে চলে যায়। পরে গ্রামের লোকজন মৃতদেহ গুলো সেই স্থানেই মাটি চাপা দিয়ে দেয়। যারা নিহত হয়েছিলেন সেদিন তারা হলেন-

(১) শ্রীকান্ত হালদার।
(২) গুরুপদ হালদার।
(৩) সুসান্ত কুমার কুন্ডু, শ্রীমন্ত কুন্ডু সহ আরও ১০/১১ জন।

এদেরকে হত্যা করার পর পাকবাহিনীর সদস্যরা সেদিন শীতল পুরের হিন্দুদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়। সৃষ্টিচরণ হালদার নামে একজনকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করে। আগস্ট মাসের শেষ দিকে নৌকায় করে নদী পাড় হওয়ার সময় শীতলপুর গ্রামের অজিত কুমার চক্রবর্তী, কার্তিক কুমার চক্রবর্তী ও নুরু চৌধুরী সুজানগর থানার পুকুরনিয়া গ্রামের কাছে এসে পাক আর্মিদের হাতে ধরা পড়ে। ধৃত স্থানেই তাদেরকে হত্যা করা হয়।

(ঙ) জনাব, জয়নাল আবেদিন।
স্থানীয়: মুক্তিযোদ্ধা।
গ্রাম- সান্যালপাড়া, বেড়া।

১৯৭১ সালের জুন মাসের শেষ দিকে মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করার অভিযোগে বেড়া ওয়াপদা রেস্ট হাউজের দারোয়ান রজব আলীকে বেড়া হাসপাতাল সংলগ্ন ব্রীজের উপর গুলি করে হত্যা করা হয়। বেড়া উপজেলায় পাকবাহিনীরা তাদের ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল নগরবাড়িতে। এখানে অবস্থান করে তারা স্থনীয় রাজাকারদের সহায়তায় মুক্তিযোদ্ধাদের খোঁজ খবর রাখত এবং বিভিন্ন সময় অত্যাচার চালাত। কাশিনাথপুর এবং বেড়া কলেজে পাকবাহিনীর সদস্যরা একটি করে আশ্রয়স্থল তৈরী করেছিল। আগস্ট মাসের মাঝামাঝি সময়ে তারা বেড়া উপজেলার দক্ষিণ পাড়া গ্রামে প্রবেশ করে কয়েকজন রাজাকারকে সাথে নিয়ে। এই গ্রামের শমসের মেম্বার আর্মিদের দেখে ভয়ে না পালিয়ে বরং কথা বলার জন্য এগিয়ে যায়। এসময় রাজাকাররা মেম্বারের বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দেয়ার বিষয়ে অভিযোগ করলে আর্মিরা তাকে এবং আরও দুজন দুলাল (পিতা- জহির উদ্দিন) এবং আঃ সাত্তার (পিতা- সের আলী) কে ধরে থানায় নিয়ে যায়। এরপর থানা থেকে তৎকালীন ওসি এবং সি.ও জনাব মনজুরকে তার বাসা থেকে ধরে নগরবাড়ি ঘাটে তুলে নিয়ে যায়। সেখানেই তাদের পাঁচজনকে একসাথে গুলি করে হত্যা করে পাকবাহিনীর সদস্যরা।

বেড়া উপজেলার বধ্যভূমি: বেড়া উপজেলার কাশিনাথপুর, বৃশালিখা, খানপুরা ও নগরবাড়ি এলাকায় হানাদার বাহিনী নিরীহ লোকজনকে পৈশাচিক নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করে। সেখানকার স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা জানান, হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা মুক্তিযোদ্ধা ও নিরীহ লোকজনকে হত্যার পর কাশিনাথপুর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন সেতুর নিচে আত্রাই

নদীতে ফেলে দিত অথবা নদীর পাড়ে লাশ পুঁতে রাখত। ২০০১ সালের এপ্রিল মাসে শ্রমিকরা সেতুর নিচে মাটি কাটার সময় মানুষের মাথার খুলি ও হাড় খঁজে পায়।

মুক্তিযুদ্ধে পাবনার বেড়া ও সাঁথিয়ায় গণহত্যার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্দেশদাতা ছিল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামি। মুক্তিযোদ্ধা আবু বকর সিদ্দিক ও কাজী আজম জানান, ১৯৭১ সালের ১৯ এপ্রিল পাকিস্তানি আর্মিরা নগরবাড়ি ঘাট থেকে বেড়া উপজেলার অভ্যন্তরে এসে প্রায় ৩০০ বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে দেয়। এসময় সম্মুখ যুদ্ধে ১৭ জন নিহত হয়। যারা নিহত হয়েছিল তাদের লাশ সেখানেই গণকবর দেয়া হয়।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ শুরু হওয়া পাক হানাদার বাহিনীদের অত্যাচার ও নির্মম হত্যাকান্ড সমগ্র দেশব্যাপী এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এলাকাগুলোও সেই তান্ডব থেকে রেহাই পায়নি। আর এই নৃশংস কাজে হানাদার বাহিনীদের পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করেছে রাজাকার, আলবদর, আল-শামস। এসকল হীন মনের মানুষরূপী অমানুষদের জন্যই মৃতের সংখ্যা এত অধিক হয়েছিল। আজও বাংলাদেশ বয়ে বেড়াচ্ছে সেই ভয়াল স্মৃতি। এদেশের বিভিন্ন স্থানে রয়েছে সেসকল স্মৃতিচিহ্ন। যার অধিকাংশই আজ পর্যন্ত চিহ্নিত হয়নি। তন্মধ্যে যতগুলো আবার চিহ্নিত হয়েছে তার বেশির ভাগই পড়ে আছে অযত্ন আর অবহেলায়।

মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাবনা জেলার ৯টি উপজেলায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও রাজাকাররা নির্বিচারে যেসকল স্থানে নৃশংস হত্যাকান্ড চালিয়েছিল সেসব বধ্যভূমি যথাযথ সংরক্ষনের অভাবে নিশ্চিহ্ন প্রায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, একাত্তরের বর্বর গণহত্যার সাক্ষী হয়ে আছে পাবনা জেলার বেড়া উপজেলার কাশীনাথপুর, বৃশালিখা, খানপুরা ও নগরবাড়ির বধ্যভূমি সমূহ। স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা জানান, পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসররা মুক্তিযোদ্ধা ও নিরীহ লোকজনদের হত্যার পর কাশীনাথপুর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন সেতুর নিচে আত্রাই নদীতে ফেলে দিত অথবা নদীপাড়ে লাশ পুঁতে রাখত। বর্তমানে যদিও আত্রাই নদীটি মরা খালে পরিণত হয়েছে তবে একসময় নদীটি প্রবল স্রোতস্বিনী ছিল। পাবনা জেলার বিভিন্ন উপজেলায় হত্যাকান্ড ঘটিয়ে লাশ নিয়ে এসে এই নদীতে ফেলে দেয়া হত।

এই ঘটনার পর স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা স্থানটিকে বধ্যভূমি হিসেবে সংরক্ষণ ও সেখানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মানের দাবি জানিয়ে আসছেন। কিন্তু দীর্ঘদিন পার হলেও তেমন কোনো উদ্যোগ নেওয়া তো দূরের কথা বরং স্থানটি দিনে দিনে বেদখল হয়ে যাচ্ছে। স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা নজরুল ইসলাম জানান, মাটি কাটার সময় শ্রমিকরা যে হাড়গোড় পেয়েছিল সেগুলো সংগ্রহ করে তার কাছে রাখা হয়েছিল। যেগুলো তিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে প্রদানের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে সেগুলো তিনি মাটি চাপা দিয়ে দেন।। (“অযত্নে পড়ে আছে বধ্যভূমি ”, প্রথম আলো, পাবনা অফিস ও বেড়া প্রতিনিধি, ২১-০৩-২০১১)।

১৯৭১ সালে বৃশালিখা, খানপুরা, নগরবাড়ি, বাউশগাড়ি, মাধপুর, পাথালিয়াহাট ও চৈত্রহাটিতে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসররা নৃশংস হত্যাকান্ড ঘটায়। বধ্যভূমির এইস্থানগুলো সংরক্ষণের অভাবে নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে। বেড়া উপজেলার মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কমান্ডার আলহাজ ইসহাক আলী বলেন, বেড়ার বধভূমিগুলো অযত্নে পড়ে আছে।তবে খানপুরায় অবস্থিত বধ্যভূমিটি সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়ে সেখানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের আশ্বাস দেয়া হয়েছে।

এছাড়া বেড়া উপজেলার চড়পাড়া ও বেড়া সরকারি বি.বি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের পাশে বধ্যভূমির অবস্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। (সূত্র: D:\Drive(D)\Ministry 2010\Brif.doc)

মূল আলোচনা: ১৯৭১ সালের ৩১ মার্চ মুক্তিযোদ্ধারা নগরবাড়ি ফেরীঘাটে পাকসেনাদেও প্রতিরোধ করে। ৯ এপ্রিল নগরবাড়ি ফেরীঘাটে পাকবাহিনীরা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধ ভাঙার জন্য বিমান থেকে গোলাবর্ষণ করলে কিছুসংখ্যক নিরীহ লোক নিহত হয়। ১৯ এপ্রিল বেড়া-সাঁথিয়ার সংযোগস্থল পাইকরহাটির নগরবাড়ি-বগুড়া

মহাসড়কের উপর মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে পাকিস্তানিদের লড়াইয়ে ২৫ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন এবং এসময় প্রায় ১৫০ জন পাকসেনা নিহত হয়। জুলাই-আগস্ট মাসে নকশালরা মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ করে ৫৭টি রাইফেল ছিনিয়ে নেয়। এই উপজেলার শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে শহীদ আব্দুল খালেক, জয়গুরু ও নাজিম উদ্দিনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বেড়া উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা পাবনা জেলার অন্যান্য উপজেলার তুলনায় অনেক কম ছিল। তাছাড়া যুদ্ধকালীন সময়ে সমগ্র এলাকা বন্যার অথৈই পানিতে তলিয়ে যাওয়ার কারনে যুদ্ধের পরিস্থিতি কোন পক্ষেরই অনুকূলে ছিল না। তবে, এই এলাকার মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতার কারনেই স্থানীয় রাজাকার-আলবদর বাহিনীর কর্মকান্ড বেশিদূর গড়াতে পারেনি। বেড়া উপজেলার মুক্তিযোদ্ধারা চূড়ান্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলে ১৪ ডিসেম্বর। ঐদিনই মূলত মুক্তিযোদ্ধারা তিন দলে বিভক্ত হয়ে বেড়া থানা ঘিরে ফেলে এবং নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। এরপর তারা সেখানে অবস্থানরত হানাদার বাহিনী ও রাজকারদেও আত্মসমর্পন করতে বলে। বেড়া ১৬ ডিসেম্বর পাকহানাদার মুক্ত হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে ১৪ ডিসেম্বর হানাদার মুক্ত হয়। (সূত্র: দীপক দত্ত, '১৪ ডিসেম্বর বেড়া শহর পাকহানাদার বাহিনীর কবল থেকে মুক্ত হয়েছিল', দৈনিক সংবাদ, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৯৪। ওসমান গণি, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ শত্রুমুক্ত হলো বেড়া', আজকের কাগজ, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৯১)।

১৪ ডিসেম্বর বেড়া থানা থেকে হানাদার বাহিনী পালিয়ে বাঘাবাড়ি ঘাট ও নগরবাড়ি ঘাটের দিকে যেতে থাকে। এরপরের দিন অর্থাৎ ১৫ ডিসেম্বর এই দুটি স্থানের ওপর ভারতীয় মিত্রবাহিনী ব্যাপক গোলাবর্ষণ শুরু করে। এতে করে নগরবাড়ি ঘাট ও তার আশেপাশের এলাকা বিধ্বস্ত হয়ে যায়। বোমার আঘাতে শত শত পাকসেনা মারা যায়। যারা বেঁচে ছিল তাদেরকে মুক্তিযোদ্ধারা গুলি করে হত্যা করে। অর্থাৎ ১৬ ডিসেম্বর পাবনা জেলা মুক্ত হওয়ার আগেই বেড়া উপজেলা পাক-হানাদার মুক্ত হয়।

১৯৭১ সালের মার্চ মাস থেকে শুরু করে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বেড়া উপজেলায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বিভিন্ন ভাবে তাদের অত্যাচার মূলক কর্মকান্ড অব্যাহত রেখেছিল। এদের সহায়তা করেছিল স্থানীয় রাজাকার, আলবদর, আলশামস। যেকারনে হতাহতের সংখ্যা এত অধিক ছিল। গণহারে হত্যা করা হয়েছিল সাধারন মানুষদের। আর লাশ পুঁতে রাখা হয়েছিল মাটিতে। কিন্তু তার থেকেও বেদনাদায়ক বিষয় হলো এসকল বধ্যভূমি সঠিক ভাবে তদারকি না করা। যা কখনই কাম্য নয়। হানাদার বাহিনীদের কৃত নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার প্রমাণ বহন করা গণহত্যার সঠিক ইতিহাস নিরুপণ করা এবং বধ্যভূমি সমূহের সঠিক সংখ্যা নির্ধারন করা এখন সময়ের দাবি।

উপসংহার: বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ। এই স্বাধীনতা একদিনে আসেনি। বাঙালি জাতিকে এজন্য সহ্য করতে হয়েছিল অবর্ণনীয় নির্যাতন, লক্ষ মা-বোনকে হারাতে হয়েছিল তাদের সম্ভ্রম। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হলেও এর পথ পরিক্রমা ততটা সহজ বা মসৃণ ছিল না। ১৯৭১ সালে যে স্বপ্ন নিয়ে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল সেই স্বপ্নে বাধ সাধা হয়েছিল শুরু থেকেই। এদেশের মানুষরা যখন পাকিস্তানিদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ ঠিক সেই সময় বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর তেজদীপ্ত কণ্ঠে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন। যে ডাকে সাড়া দিয়েছিল সমগ্র বাঙালি জাতি। সকল প্রকার নির্যাতন আর অত্যাচরের অবসান ঘটানোই ছিল একমাত্র লক্ষ্য। পাকিস্তানি হায়েনার দল যখন নিজেদের করুণ পরিণতির কথা বুঝতে পেরেছিল ঠিক সেই সময় থেকেই তারা ষড়যন্ত্রের নীল নকশা বুনতে থাকে। ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ পাকসেনারা হঠাৎ করে কোনো রকম পূর্ব আভাস না দিয়ে ঘুমন্ত বাঙালির উপর আঘাত হানে। মুহূর্তের মধ্যে তাদের কর্মকান্ড নৃশংস রূপ ধারন করে। ২৫ মার্চ শুরু হওয়া তাদের এই হত্যাযজ্ঞ চলতে থাকে সূদীর্ঘ নয় মাস। এই নয় মাসে বাংলাদেশে সব জায়গায় হায়েনারা নির্বিচারে মানুষ হত্যা শুরু করে। সমগ্র দেশ ব্যাপী চালানো এই গণহত্যার দরুন বাংলাদেশ পরিণত হয় এক বধ্যভূমিতে। বর্তমান গবেষণায় পাকবাহিনীদের গণহত্যা যে প্রত্যন্ত অঞ্চল বেড়াতেও সংঘটিত হয়েছিল এবং সেখানেও যে বধ্যভূমি রয়েছে সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা তৈরী করার প্রয়াস করা হয়েছে।

তথ্য নির্দেশিকা:

- বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন (জুন, ২০১৪)। "এক নজরে বেড়া"। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। ২৫ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৪।
- "Population Census Wing, BBS".২০০৫-৩-২৭ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১০ নভেম্বর, ২০১৬।
- ড. অশোক বিশ্বাস, বাংলাদেশের নদীকোষ, গতিধারা প্রকাশনী, ঢাকা। প্রকাশকাল- ফেব্রুয়ারী, ২০১১, পৃষ্ঠা ৪০২।
- ডা. এম.এ হাসান, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ঃ যুদ্ধাপরাধ ও গণহত্যা।
- Stanton, Gregory H, What is Genocide?
- Duwe, Grant (2007), Mass Murder in the United States, page no 15. Jefferson, NC: McFarland & Company,
- Legal definition of genocide (PDF), United Nation.
- Serial Murder-Multi Disciplinary perspectives for Investigators (PDF). Federal Bureau 0f Investigation, 2005.
- Adam Jones, Genocide: A Comprehensive Introduction, second edition, page no 271.
- Pair Guilty of 'Insulting Turkey', 11 October 2007. BBC News,
- http://archive.prothom-alo.com/detail/date/2012-10-22/news/27469.
- http://www.tribuneindia.com/1999/99aug08/world.htm#7.
- অযত্ন অবহেলায় পাবনার বধ্যভূমি, দৈনিক সমকাল, ২৮ মার্চ, ২০১৫।
- রবিউল ইসলাম রবি, পাবনা ১৯৭১, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, প্রকাশকাল ডিসেম্বর ২০১৬।
- মুক্তি-চেতনা, স্মরণিকা-২০১৫, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, বেড়া উপজেলা কমান্ড, বেড়া পাবনা, সম্পাদনা- আলহাজ্ব ইসহাক আলী।
- অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ, মুক্তিযুদ্ধের কিছু কথা-পাবনা জেলা।
- সুকুমার বিশ্বাস,পাবনা জেলার গণহত্যা ও গণকবর।